ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী না হলে কেলেঙ্কারি আবারও ঘটতে পারে

মোহাম্মদ এ (রুমী) আলী ২০০৭ সালে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদে যোগ দেন এবং ২০০৮-এ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ব্র্যাকের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০২-০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকে রেগুলেটরি রিফর্ম, বিশেষ করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকসের ভাইস চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত হলমার্ক কেলেঙ্কারি, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের বর্তমান অবস্থা, পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা, ব্যাংক পরিচালনায় নৈতিকতা, বিল ডিসকাউন্টিং, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও বেসরকারি ব্যাংকের কার্যক্রমসহ নানা বিষয়ে কথা বলেন *বণিক বার্তার* সঙ্গে।

পড়ুন পৃষ্ঠা ৪

মোহাম্মদ এ (রুমী) আলী ২০০৭ সালে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদে যোগদান করেন এবং ২০০৮-এ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ব্র্যাকের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০২-২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকে রেগুলেটরি রিফর্ম বিশেষ করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকসের ভাইস চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত হলমার্ক কেলেঙ্কারি, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের বর্তমান অবস্থা, পরিচালনা পর্ষদ, ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও বেসরকারি ব্যাংকের কার্যক্রমসহ নানা বিষয়ে দীর্ঘ সময় কথা বলেন *বণিক বার্তার* সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাকিব তনু

ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী না হলে কেলেঙ্কারি আবারও ঘটতে পারে

সোনালী ব্যাংকে হলমার্ক জালিয়াতির বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

সোনালী ব্যাংকের একটি শাখা থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের ঘটনাটি পরিমাণের দিক থেকে বাংলাদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন। এখানে অর্থের পরিমাণের চেয়ে বড় বিষয় হলো— রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেশের বাইরে এবং দেশের আর্থিক খাতে আস্থার সংকট তৈরি করবে এ ঘটনা।

আপনি কি মনে করেন এ ঘটনায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে?

এখনো সাধারণ গ্রাহকদের মাঝে আস্থার সংকট তৈরি হয়নি। এটি হলে গ্রাহকরা এসব ব্যাংক থেকে অর্থ উঠিয়ে নিতে শুরু করতেন। তা যখন হয়নি, তার মানে আস্থার সংকট গ্রাহকদের মাঝে এখনো তীব্র হয়নি। সাধারণ গ্রাহক সবসময়ই মনে করেন, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের পাশে দাঁড়াবে সরকার, ফলে তাদের এতটা চিন্তা নেই।

তাহলে কাদের আস্থার সংকট তৈরি হবে?

আস্থার সংকট তৈরি হবে আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে। আমরা জানি, একটি ব্যাংক আরেকটি ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল এবং পুরো ব্যাংকব্যবস্থা চলে বিশ্বাসের ওপর। এখানে আস্থার সংকট তৈরি হলে এর প্রভাব হবে বড় এবং সুদূরপ্রসারী। এ ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংককে অন্য ব্যাংক অর্থ দিতে কুণ্ঠা বোধ করবে। এমনকি তাদের ইস্যুকৃত বিল কিনতে দ্বিধা করবে। এর প্রভাব বিদেশে সোনালী ব্যাংকের করেসপনডেন্ট ব্যাংক বা যারা সোনালী ব্যাংকের সঙ্গে ব্যবসায় সক্রিয় তাদের ওপরও পড়বে।

সোনালী ব্যাংকের মতো ঘটনা কি আপনার ব্যাংকেও ঘটেছিল?

আমার ব্যাংকিং ক্যারিয়ারেও এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল। সোনালী ব্যাংকের গ্যারান্টিতে অর্থ দিয়ে আমি যে ব্যাংকের সিইও ছিলাম, সে ব্যাংকও বিপাকে পড়েছিল। অর্থ পাওয়া অনিশ্চিত মনে হচ্ছিল। যদিও পরে সে অর্থ আদায় করা হয়। কিন্তু মাত্রায় সেটি ছিল কম। এ ক্ষেত্রে আস্থার কারণ ছিল, সোনালী ব্যাংকের মালিকানা।

সংকটই যখন হচ্ছে, তাহলে কেন এবং কীসের আস্থায় এত বড় ঝুঁকি নেয়া হয়েছে?

ভালো প্রশ্ন। আমি আগেই বলেছি, ব্যাংক সাধারণত ব্যালান্সশিটের ওপর ভিত্তি করে ঝুঁকি নেয়। তবে আমার মনে হয় সোনালী ব্যাংকের ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু ভিন্ন। সোনালী ব্যাংক একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, এর মালিকানা রাষ্ট্র। তাই ঝুঁকিটাকে কোয়াসি-সভেরিন বলে ধারণা করা হয়।

ইনল্যান্ড বিল বা গ্যারান্টি অথবা যেকোনো বিষয়ে বলেন না কেন, আসলে আস্থাটা আসে কমিটমেন্টের জায়গা থেকে। কিন্তু অন্যান্য ব্যাংক যখন দেখবে সোনালী ব্যাংকের গ্যারান্টি দেয়া বিল কিনে বিপাকে পড়ছে, তখন এটি ক্রয়ে আগ্রহ দেখাবে না তারা। শোনা যাচ্ছে, বিলে যারা স্বাক্ষর করেছেন, তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষ নয় অথবা হলমার্কের ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম মেনে সোনালী ব্যাংক তা করেনি। এতে ব্যাংকের আস্থায় চিড় ধরবে। ২৬টি ব্যাংক, যারা সোনালী ব্যাংকের একসেপট্যান্স দেয়া বিল কিনেছে, তারা অনিশ্চয়তায় পড়ে যাবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আস্থার সংকট হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

হলমার্ক কেলেঙ্কারি সোনালী ব্যাংকের জন্য কতটা সংকটের?

ঘটনাটা বেসরকারি কোনো ব্যাংকে ঘটলে আস্থার সংকট অবশ্যই তৈরি হতো। সোনালী ব্যাংকের ক্ষেত্রে ঘটনাটি ভিন্ন হতেও পারে। শুধু তাত্ত্বিক ভিত্তিতে এটি বিশ্লেষণ করা যৌক্তিক হবে না। ঝুঁকিও সেভাবে গণ্য করা চলে না। তবে একটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যখন মনে করে সরকার তার পেছনে আছে এবং সবকিছু করতে পারবে, তা মেনে নেয়া যায় না। গ্যারান্টি আছে কি না, সেটি ভিন্ন বিষয়। তাদের মূলধন আছে কি না, সাধারণ মানুষ তা দেখবে না; দেখবে আর্থিক ব্যবস্থাপক। যদি বলা হয় সোনালী ব্যাংকের মূলধনের তুলনায় জালিয়াতির পরিমাণ কম, তবে সেটি হাস্যকর। তাদের প্রশ্নবিদ্ধ অর্থের পুরোটা প্রভিশন করতে বলা হলে মূলধনের পুরোটাই চলে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, বিদেশী ব্যাংক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের বিল কেনার ক্ষেত্রে সতর্ক আচরণ করছে। কিন্তু কেন? তারা চিন্তা করছে, সোনালী ব্যাংককে পুরো প্রভিশন করতে হলে তাদের মূলধন নেগেটিভ হয়ে যেতে পারে বা মূলধনই থাকবে না। আর্থিক ব্যবস্থাপকদের রেটিংয়ে সোনালী ব্যাংক অনেক নিচে চলে যাবে। এতে সব বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংক সতর্ক হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে তারা যদি সোনালী ব্যাংকের বিল না কেনে বা লেটার অব ক্রেডিট নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তাহলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। এটা সোনালী ব্যাংকের জন্য বড় সংকট। এটি বেসরকারি ব্যাংক হলে তার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিত। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বলেই হয়তো এ থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারবে তারা।

অনেকে সোনালী ব্যাংকের এ ঘটনায় আশ্চর্যান্বিত। আপনি কীভাবে দেখছেন?

অর্থের পরিমাণ দেখে বিশেষজ্ঞরা আশ্চর্য হয়েছেন। বড় শাখা হলে ভিন্ন কথা ছিল, সোনালী ব্যাংকের ছোট্ট একটি শাখা এত বড় ঝুঁকি নিয়েছে, এতে আশ্চর্য হওয়ারই কথা। ১০-২০ কোটি টাকা হলে অস্বাভাবিক মনে হতো না। এখানে অর্থের পরিমাণ প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা!

সোনালী ব্যাংকে সংঘটিত কেলেঙ্কারির এ অর্থ উদ্ধার করা যাবে বলে মনে করেন কি?

এ জন্য ঘটনার পুরোটা জানা প্রয়োজন— ব্যাংকের কতটুকু রিস্ক এক্সপোজার আছে, কতটুকু জামানত আছে, কী আইনি দাবি আছে, জামানতের কতটুকু উদ্ধার করা যাবে, প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ অ্যাসেসমেন্ট বা হিসাব কী হয়েছে, তা সম্পূর্ণ আমাদের জানা নেই। তাই এ মুহূর্তে উদ্ধারের ব্যাপারে বলা যাবে না।

তবে যা প্রয়োজন— সোনালী ব্যাংকে জালিয়াতি হয়েছে প্রথমেই তা স্বীকার করে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, কীভাবে তা উদ্ধার বা পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা যাবে, সেটা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। কেলেঙ্কারির সঙ্গে কারা কারা জড়িত, তাদের খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যাংকে কোনো ঋণ কুঋণে পরিণত হলে যে কর্মকর্তা এ ঋণ দিয়েছেন, তাকে চাকরি থেকে বের করে দেয়া হয় না। সময় নির্ধারণ করে তাকে বলা হয় অর্থ ফেরত আনতে। যিনি ঋণ দিয়েছেন, তিনি গ্রাহককে সবচেয়ে ভালোভাবে চেনেন, তাই অর্থ উদ্ধারে অবশ্যই তাকে ব্যবহার করতে হবে। কমবেশি সব ব্যাংকই এ পদ্ধতি অনুসরণ করে। যখন বলা হয় এ ঘটনার জন্য সে দায়ী, আমি নই। আবার অন্যজন বলে আমি না, সে। তখন প্রকৃত বিষয় চাপা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এটা হওয়া উচিত নয়। প্রথম ইস্যু হলো, কীভাবে এ ধরনের জালিয়াতি বন্ধ করা যাবে। গ্রাহক সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে সর্বাগ্রে। এ ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সেপারেশন অব ডিউটি ইজ ভেরি ইমপর্টেন্ট।

বিল ডিসকাউন্ট ব্যাংকিং খাতে নতুন বিষয় নয়, তাহলে সমস্যা কোথায়?

বিল ডিসকাউন্ট ফিন্যান্সিং একটি সর্বজনবিদিত ও প্রয়োজনীয় পদ্ধতি। এটি তারল্যের চাহিদা পূরণ করে। আয় তারল্য ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে না। আসলে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কতগুলো নিয়ম-পদ্ধতি আছে। হলমার্কের ক্ষেত্রে সেগুলো মানা হয়নি।

সমস্যাটা কোথায়? তা থেকে উত্তরণের উপায়ই বা কী?

বড় সমস্যা হলো, আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশ্নবিদ্ধ এবং যুগপোযোগী নয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানিতে সেন্ট্রালাইজ পদ্ধতিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার হিসাব করা হয় না। এখানে শাখাভিত্তিক ঝুঁকি নির্ণয় করা হয়। এতে অনেক ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বা এর নির্ণয় পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

> ব্যাংকের পরিচালকদের কি কি গুণ ও দক্ষতা থাকতে হবে, সে বিষয়ে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ১৬৯৭ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে পাঁচটি বিষয় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে— ১. সততা ২. সক্ষমতা ৩. পরিশ্রম ৪. সময় প্রদানে সক্ষম ও ৫. সমাজে মর্যাদাশীল। বর্তমান প্রেক্ষাপটেও এটি একটি গ্রহণযোগ্য দলিল। আমাদের দেশের অনেক পর্ষদের পরিচালক জানেন না তার দায়িত্ব কী। পরিচালকদের দক্ষতা ও কর্মপরিধি বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উদ্যোগ নিয়েছিল। কোর্সও চালু করা হয়েছিল। সেখানে পাঁচ শতাংশ পরিচালকের উপস্থিতিও পাওয়া যায়নি

আমাদের দেশে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতির উন্নয়ন প্রয়োজন। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে রিস্ক অ্যাপ্রুভালের পদ্ধতি সেন্ট্রালাইজড। আমি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কর্মরত অবস্থায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন প্রণয়ন করি। ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে তিনটি ভাগ বা স্ট্রিম প্রয়োজন হয়। একটি গ্রুপ থাকবে, যারা ঋণ অনুমোদন করবেন। দ্বিতীয় গ্রুপ যাচাই-বাছাই করবে এবং তৃতীয় গ্রুপ ডিসভার্স বা ছাড় করবে। এ ক্ষেত্রে যিনি রিকমেন্ড করছেন, তিনি ঝুঁকি অ্যাপ্রুভাল করছে না। কারণ রিকমেন্ডকারী স্বভাবতই চাইবেন যত বেশি ব্যবসা হয়। কিন্তু স্বাধীনভাবে যিনি ঋণ অনুমোদন করছেন, তার কোনো প্রফিট রেসপনসিবিলিটি থাকবে না। তার দায়িত্ব থাকবে ঝুঁকি নেয়া সঠিক হবে কি না, তা যাচাই করা। মনে রাখতে হবে, ব্যাংককে ঝুঁকি নিতেই হবে। ঝুঁকি না নিলে ব্যবসা থেকে ছিটকে পড়বে ব্যাংক। তাই ঝুঁকি নিতে হবে, তবে তা কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবে। যিনি অর্থ ছাড় করবেন, তাকে দেখতে হবে সব শর্ত পূরণ করা হয়েছে কি না। যখন পুরো প্রক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে, তখন দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া কঠিন হবে। পুরো প্রক্রিয়াটি চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের মধ্যে চলে আসবে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কর্মপদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করা না হলে হলমার্কের মতো এমন কেলেঙ্কারির ঘটনা আবারও ঘটতে পারে।

বিল ডিসকাউন্টিং কি তাহলে বন্ধই করে দেয়া উচিত?

বিল ডিসকাউন্টিং পদ্ধতি থাকবে, বিশ্বের প্রতিটি দেশেই এটি রয়েছে। এ পদ্ধতি বন্ধ হয়ে যাওয়া বা বন্ধ করে দেয়া দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। এ ক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্র্যাক ব্যাংককে যেমন বলেছি, প্রসেসটা শক্তিশালী করতে, কিন্তু পদ্ধতিটা বন্ধ না করতে। পদ্ধতিটা হঠাৎ বন্ধ করে গ্রাহককে বিপদে ফেলা যাবে না। বিল ডিসকাউন্টিংয়ে ঝুঁকি আছে। কেউ বলতে পারবেন না, ব্যাক টু ব্যাক এলসি আছে বলে এতে ঝুঁকি নেই। ঝুঁকি আছে, যা আমরা সোনালী ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেখলাম। এটা এমন একটি সেবা, যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি ব্যাংক তার গ্রাহককে নিয়ে থাকে। সোনালী ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাইরের হস্তক্ষেপ থাকতে পারে। নইলে এত বড় কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটতে পারে না। গ্রাহক যখন অন্য ব্যাংকের গ্যারান্টি করা একটি বিল নিয়ে আসেন বা ডিসকাউন্ট করেন, তখন ব্যাংক সেবা প্রদান করবে ব্যবসা ও গ্রাহক ধরে রাখার স্বার্থে। এ ক্ষেত্রে একটি অনুমোদিত ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ ওই পরিমাণ অর্থ দেয়া হবে, ব্যাংক যা আদায় করতে পারবে বলে মনে করে। সোনালী ব্যাংকের গ্যারান্টি আছে বলেই সব ঝুঁকি নেবে, তা ঠিক নয়। আমি যদি ব্যাংক থেকে অর্থ না পাই, তাহলে গ্রাহকের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। আমার ব্যাংকে গ্রাহকের যে পরিমাণ সম্পদ আছে, তার ওপর ভিত্তি করেই বিল ডিসকাউন্ট করতে হবে। এখানে প্রশ্ন হলো— হলমার্কের মতো কোম্পানিকে কেন আড়াই হাজার কোটি টাকার লিমিট দেয়া হলো? একটি শাখা নির্দিষ্ট সীমার বেশি ঋণ জোগাতে পারে না। সোনালী ব্যাংকের শাখার ঋণ অনুমোদনের লিমিট কত, তা আমার জানা নেই। মনে হয় না ১-২ কোটি টাকার বেশি হবে। যদি তা-ই হয়, তাহলে কে এ বিলগুলো অনুমোদন করেছে। যদি না করে থাকে, তাহলে জালিয়াতি হয়েছে।

হলমার্কের কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের দায় কতটা?

কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ক্ষমতা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে আমি জানি, ব্যাংকে কিছু ঘটলে পরিচালনা পর্ষদের দোষ দেয়া হবেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের দোহাই দিয়ে এ অভিযোগ থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না। পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব আছে। আমি ব্যাংকের পর্ষদে শেয়ারহোল্ডারের একজন প্রতিনিধি। তাই শেয়ারহোল্ডারের স্বার্থ রক্ষা করা আমার দায়িত্ব।

কিন্তু পরিচালনা পর্ষদ কীভাবে এ ধরনের দুর্নীতি প্রতিহত করবে?

পর্ষদের চেয়ারম্যানের অবশ্যই দায়িত্ব আছে। তলব করাসহ অনেক ক্ষমতা দেয়া আছে চেয়ারম্যানকে। পর্ষদের সদস্যরা চেয়ারম্যানের মাধ্যমে অনৈতিক ও অবৈধ কাজ থেকে ব্যাংককে বিরত রাখতে পারে। ঋণের অনুমোদন এখনো পর্ষদের হাতে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের দুটি গাইডলাইন রয়েছে। এখানেও আছে কিছু বৈপরীত্য, যার সুবিধা নেন অনেকে। ঘটনা যখন ঘটবে, তখন বলবেন, এর দায় আমার নয়। এটা কাম্য নয়। মনে রাখতে হবে শুধু গাইডলাইন দিয়ে শতভাগ সাফল্যের সঙ্গে ব্যাংক পরিচালনা করা যায় না। পর্ষদের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

তবে এটাও সত্য, চেয়ারম্যান ও পরিচালকদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালায় কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। অনেক সময় ম্যানেজমেন্ট এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পর্ষদকে অন্ধকারে রাখে। বাংলাদেশ ব্যাংক যদি মনে করে পর্ষদকে দায়িত্ব নিতে হবে, তবে নীতিমালা পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। ম্যানেজমেন্ট ও পর্ষদ যেন নিজ নিজ ভূমিকা রাখতে পারে সে জন্য নীতিমালায় ভারসাম্য থাকতে হবে। শুধু দায়িত্ব দিয়ে এর সঙ্গে ক্ষমতা না দিলে— পর্ষদের দায় নেই বলার সুযোগ থেকেই যাবে।

পর্ষদের গঠন নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। সব সদস্যকে ব্যাংক বা ফিন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি বিষয়ে দক্ষ হতে হবে, তা নয়। তাদের অনেক ভূমিকা রয়েছে। তাদের সক্ষমতা ও দক্ষতা থাকতে হবে। শুধু ব্যাংকিং জানলেই হবে না, মানবসম্পদের সুব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে হবে। ব্যাংকে সিএসআর নীতিমালা রয়েছে, তারা দেখবেন তা সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কি না। পর্ষদের সদস্যরা রাজনীতিক হতে পারবেন না, এমন কোথাও নেই। পরিচালনা পর্ষদে সব ধরনের মানুষের সমাবেশ ঘটাতে অসুবিধা নেই। তবে ব্যাংকার ও ফিন্যান্সিয়াল এক্সপার্ট কিছু থাকতে হবে, তাদের ছাড়া ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা উচিত নয়।

বিদেশী ব্যাংকের অভিজ্ঞতার আলোকে পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

ব্যাংক একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সর্বোপরি এটি উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। একটি কোম্পানি নিজের ইকুইটি এবং ব্যাংকের কিছু অর্থের ওপর ঝুঁকি নেয়। গ্রাহকের সম্পদের গার্ডিয়ান হিসেবে কাজ করে একটি ব্যাংক। ব্যাংকের পরিচালকদের কি কি গুণ ও দক্ষতা থাকতে হবে, সে বিষয়ে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ১৬৯৭ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে পাঁচটি বিষয় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে— ১. সততা ২. সক্ষমতা ৩. পরিশ্রম ৪. সময় প্রদানে সক্ষম ও ৫. সমাজে মর্যাদাশীল। বর্তমান প্রেক্ষাপটেও এটি একটি গ্রহণযোগ্য দলিল। আমাদের দেশের অনেক পর্ষদের পরিচালক জানেন না তার দায়িত্ব কী। পরিচালকদের দক্ষতা ও কর্মপরিধি বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উদ্যোগ নিয়েছিল। কোর্সও চালু করা হয়েছিল। সেখানে পাঁচ শতাংশ পরিচালকের উপস্থিতিও পাওয়া যায়নি।

উন্নত দেশে ব্যাংকের ভালো-মন্দের দায় অবশ্যই পর্ষদের সদস্যদের নিতে হয়। বাংলাদেশের চেয়ে বিশ্বের অন্য দেশের পর্ষদের সদস্যদের দায় অনেক বেশি। তাদের প্রত্যেক পর্ষদ সদস্যের ইন্স্যুরেন্স করা আছে এবং তা বাধ্যতামূলক। তাদের কার্যক্রমের বিপরীতে যদি কোনো কেস বা জরিমানা হয়, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তা বহন করে। সোনালী ব্যাংকের ঋণ কেলেঙ্কারির দায় অবশ্যই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের রয়েছে। যদি ধরি তারা জানতেন না, তবে কেন জানতেন না? আমার ব্যাংকে বড় ধরনের জালিয়াতি বা কেলেঙ্কারি সংঘটিত হলে আমাকে এর দায় নিতে হবে। যদি বলি, আমি জানি না, এটা ব্যবস্থাপকের কাজ, তাহলে তো চলবে না। ঘটনাটির দায় নিয়ে কী করা উচিত, তা নির্ভর করে ব্যক্তির ওপর। হয় পদত্যাগ, না হয় সত্য প্রমাণে লড়াই করতে হবে। (বাকি অংশ আগামীকাল)

মোহাম্মদ এ (রুমী) আলী ২০০৭ সালে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদে যোগদান করেন এবং ২০০৮-এ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ব্র্যাকের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০২-২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকে রেগুলেটরি রিফর্ম, বিশেষ করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকসের ভাইস চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত হলমার্ক কেলেঙ্কারি, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের বর্তমান অবস্থা, পরিচালনা পর্ষদ, ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও বেসরকারি ব্যাংকের কার্যক্রমসহ নানা বিষয়ে দীর্ঘ সময় কথা বলেন *বণিক বার্তার* সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাকিব তনু**

সব রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক নিয়ন্ত্রণের অধিকার বাংলাদেশ ব্যাংককে দিতে হবে

গতকালের পর

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠনের ক্ষেত্রে কি কি বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন?

অন্যান্য ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পার্থক্যটা হলো— রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পর্ষদ সদস্যরা কিন্তু ব্যাংকের শেয়ার ধারণ করেন না। তবে রাষ্ট্রকে শেয়ারহোল্ডার ধরলে পর্ষদ সদস্যরা এর প্রতিনিধি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পর্ষদ সদস্য বা পরিচালকদের নিয়োগ দেয় সরকার। ব্যাংকের শেয়ারের মালিক হলে তাদের মুনাফা বাড়ানোর চেষ্টা থাকত। কারণ ব্যাংকের মুনাফা বাড়লে তিনিও এর অংশীদার হবেন। এ কারণে ব্যাংক ভালোভাবে পরিচালনায় তাদের উৎসাহ থাকে বেশি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে এ উদ্দেশ্য পূরণ করতে হলে সে ধরনের ব্যক্তিকে পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। আমি মনে করি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করে পরিচালক নিয়োগ দেয়া উচিত। অর্থ মন্ত্রণালয়ের একতরফাভাবে পরিচালক নিয়োগ দেয়া উচিত না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্ভাব্য পরিচালকদের তালিকা দিতে পারে। সেখান থেকে অর্থ মন্ত্রণালয় বা সরকার পরিচালক বাছাই করবে। লক্ষ করবেন, আমি বলছি কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিচালক নিয়োগ দেবে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়োগ দিলে সে ক্ষেত্রে নৈতিক বৈপরীত্য তৈরি হয়। তবে নিয়োগের ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ করে দিতে পারে তারা। এমনও হতে পারে, বাংলাদেশ ব্যাংক বলতে পারে— ১০ জন পর্ষদ সদস্যের মধ্যে পাঁচ-ছয়জন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ২০ জনের তালিকা বা নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়োগ দিতে হবে। এভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক নিশ্চিত করতে পারে, যেন ন্যূনতম সক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি পর্ষদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা বেশি। কেননা এসব ব্যাংকের মালিক জনগণ।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকে উচ্চপর্যায়ের প্রমোশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি কমিটি ছিল। এখন মন্ত্রণালয় থেকে সব নিয়োগ ও প্রমোশন দেয়া হয়। বিষয়টা কতটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন?

আমি যখন বাংলাদেশ ব্যাংকে ছিলাম তখন একটি কমিটি ছিল। সেখানে গভর্নর ছিলেন চেয়ারম্যান। সরকার থেকে একজন থাকতেন, একজন স্বাধীন সদস্য ও একজন ডেপুটি গভর্নর নিয়ে গঠিত হতো চার সদস্যের বোর্ড। সেখানে সাক্ষাৎকার নেয়া হতো সম্ভাব্যদের। এটা ছিল জেনারেল ম্যানেজার এবং এর ওপরের পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের প্রমোশনের জন্য। আমরা নিয়োগ দিতাম না, সুপারিশ করতাম, নিয়োগ দিত মন্ত্রণালয়।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এমডি অনেক ক্ষমতাশালী। পর্ষদ তাকে সরাতে পারে না। তাই অনেক কিছুই পর্ষদ সদস্যদের হজম করতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

এটা রাজনৈতিক বিষয়। এখানে দুই ধরনের ক্ষমতা আছে। একটি হলো প্রকৃত, আরেকটি প্রতিভাত। সাধারণ নিয়মে কী তার ক্ষমতা বা এখতিয়ার, তা লিখিত। এর বাইরে তার আর কিছু করতে পারার কথা নয়। আর প্রতিভাত ক্ষমতা ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। অবশ্য যোগাযোগ, পরিচিতি বা যোগ্যতার কারণে ক্ষমতা বেশি হতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বাংলাদেশ ব্যাংক সরাতে পারে না। তবে মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে পারে বলে মনে হয়। আগে তিন মাস পরপর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের সঙ্গে মিটিং করত বাংলাদেশ ব্যাংক। কোনটি ঠিক হয়নি, কোথায় নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হতো। এসব বাস্তবায়ন করতে আবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাপোর্ট লাগত। কাগজে যা-ই লেখা থাকুক, বাংলাদেশ ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এখানে রিফর্ম প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক দিন থেকে এটি চেষ্টা করছে; অথচ সেটি করতে দেয়া হয়নি তাকে। সব সরকারই

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে দিলে ব্যাংকিং ডিভিশনের প্রয়োজনও নেই। আগে কয়েকবার এ ডিভিশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। সরকার পরিচালনা পর্ষদ সদস্য নিয়োগ দিচ্ছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকও রয়েছে; তাহলে কেন ব্যাংকিং ডিভিশন? রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো করপোরেশন করার সময় শর্ত ছিল— ব্যাংকিং ডিভিশন থাকবে না, সবকিছু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে যাবে। পাশাপাশি করপোরেটাইজেশন করে চূড়ান্ত দায়িত্ব দিতে হবে পর্ষদকে। পর্ষদ ব্যাংক পরিচালনা করবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করবে। এটি পরিপূর্ণভাবে পালিত হচ্ছে না

এ বিষয়ে একমত বলে মনে হয়। পুরো ব্যাংকিং খাতের ৩০ শতাংশ বা এর বেশি মূলধন অথবা আমানত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রণে কিংবা এখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। রিফর্ম করতে না পারলে দেশের আর্থিক খাত শক্তিশালী হবে না।

ব্যাংকিং ডিভিশনের ভূমিকাকে কীভাবে দেখেন?

হলমার্ক কেলেঙ্কারি থেকে আমরা একটি ভালো আউটকাম আশা করব। এভরি ক্লাউড হ্যাজ এ সিলভার লাইনিং। সেটি হলো, সব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের অধিকার বাংলাদেশ ব্যাংককে দিতে হবে। শুধু কাগজে কলমে দিলে হবে না, বাস্তবিকভাবেই দিতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে দিলে ব্যাংকিং ডিভিশনের প্রয়োজনও নেই। আগে কয়েকবার এ ডিভিশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। সরকার পরিচালনা পর্ষদ সদস্য নিয়োগ দিচ্ছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকও রয়েছে; তাহলে কেন ব্যাংকিং ডিভিশন? রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো করপোরেশন করার সময় শর্ত ছিল— ব্যাংকিং ডিভিশন থাকবে না, সবকিছু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে যাবে। পাশাপাশি করপোরেটাইজেশন করে চূড়ান্ত দায়িত্ব দিতে হবে পর্ষদকে। পর্ষদ ব্যাংক পরিচালনা করবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করবে। এটি পরিপূর্ণভাবে পালিত হচ্ছে না।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বর্তমান অবস্থায় দেশের ব্যাংকিং খাতে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে বলুন।

বেসরকারি খাতে পরিচালিত ব্যাংকগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের চেয়ে ভালো করছে। কারণ তারা ভালো ঋণ ব্যবস্থাপনা করতে পারে। ২০০০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল— রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো কল মানি ও আমানতের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করবে এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ঋণ দেবে; বাকিটা বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে দেবে। সরকারের অধীনে থাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ঋণের অপব্যবহার হতে পারে, এমন ধারণা থেকে এ বিধান করা হয়েছিল। আমার মতে, আমানত সংগ্রহ করুক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো আর অতিরিক্ত অর্থ বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোকে দেয়া হোক ব্যবস্থাপনার জন্য। সরকারি ব্যাংকের কস্ট অব ফান্ড বেসরকারি ব্যাংকের তুলনায় কম। ফলে তারা ভালো মুনাফাও করতে পারে। তাদের প্রবৃদ্ধির সীমা নির্ধারণ করে দেয়া উচিত। এটি পর্ষদ বা বাংলাদেশ ব্যাংক করতে পারে। তবে এ ব্যবস্থা শুধু নির্ধারিত সময়ের জন্য হওয়া উচিত। এ সময় এ ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন ও সক্ষমতা তৈরি করা প্রয়োজন। তারপর এ ব্যবস্থা থেকে বের হওয়া যাবে। সেটি টেকসইও হবে। এখন যেভাবে আছে, তাতে আমার মনে হয় না আমরা হলমার্ক কেলেঙ্কারির মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে পারব।

দেশের ব্যাংকিং খাতের এ অস্থিতিশীল অবস্থায় নতুন ব্যাংক এলে তা সুখকর হবে বলে মনে করেন?

আমি মনে করি না দেশে নতুন ব্যাংকের প্রয়োজন আছে। বর্তমানে যেসব ব্যাংক রয়েছে সেগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালিত করলে নতুন ব্যাংকের প্রয়োজন নেই। অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, নতুন ব্যাংক এলে প্রতিযোগিতা বাড়বে। আমার প্রশ্ন হলো, ৪৭টি ব্যাংক থেকেও কি প্রতিযোগিতা হচ্ছে না? আমরা প্রায়ই দেখি ব্যাংকগুলোর মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক হস্তক্ষেপ করছে। আরও ১০টি ব্যাংক এলে কি এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে? তারা আরও বলছেন, কোনো কোনো ব্যাংক বিশেষ খাতে যেমন— ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে (এসএমই) ঋণ দেয় না। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এখন বেশির ভাগ ব্যাংকই এসএমই ঋণ দিচ্ছে; আগে দিত না। এসএমই ঋণ বিতরণে কোনো কোনো ব্যাংকের সাফল্য দেখে অন্য ব্যাংকগুলো উৎসাহিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমার মতে, ব্যাংকিং খাতে বর্তমানে স্পেশালাইজেশন দরকার। এ ক্ষেত্রে অনেক আইনকানুন রয়েছে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োগ করতে পারে।

তবে আমিই যে সব জানি, এ ধারণা করা ধৃষ্টতা। আমি যা বলছি, তা ব্যক্তিগত মতামত। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের বৃহত্তর স্বার্থে যদি মনে করে আরও ব্যাংক দরকার আছে, তারা তা করতেই পারে। *(শেষ)*